ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 54- 59
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.269

সুধাকর দলের সাহিত্যসাধনায় হজরত উমর ফারুকের (রাঃ) প্রাসঙ্গিকতা– ইতিহাসের আঙ্গিকে পর্যালোচনা

মৌসুমী দত্ত, *সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, সামসী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.01.2026; Accepted: 18.02.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Christian missionaries who came to India, particularly to Bengal, from the West began to weaken the foundations of Islam by attacking it with abusive and derogatory language. Toward the end of the nineteenth century, the *Sudhakar Group* of Bengal stepped forward to provide an appropriate response to this aggression. Centered around the journal *Sudhakar*, a number of talented Bengali Muslim writers united, collectively known as the "Sudhakar Group."

By presenting Islam correctly to the Muslim masses of Bengal, they established an ideal example that remains unparalleled. The second Caliph, Hazrat Umar (RA), followed the life and teachings of Prophet Muhammad (SAW). He succeeded in spreading Islam throughout the world and safeguarding it from the hands of the unbelievers. Drawing inspiration from the life and teachings of Hazrat Umar (RA), the Sudhakar Group initiated an intellectual movement and refuted the defamatory propaganda against Islam. Their success should not be underestimated. They had neither wealth nor manpower. Despite the lack of patronage, they possessed deep devotion and unwavering faith in Islam.

Protecting the Muslim community of Bengal from the conversion efforts of Christian missionaries and simultaneously promoting Islam through Bengali writings centered on the life and teachings of Hazrat Umar (RA), who was regarded as a guiding light of the Islamic community—these efforts of the Sudhakar Group stand as a bright example for future generations.

Keywords: Literature, Islam, Umar, Sudhakar, Muslim

সাহিত্য মানবমন ও সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব। সাহিত্য মানুষের অস্তিত্বের গভীরতাকে তুলে ধরে। সাহিত্যে মানুষের সমস্যা, জীবনধারা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আনন্দ-বেদনা, এবং পরিবর্তনের ধারা প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

> "Literature is the heartbeat of society. When the sorrows, sufferings, and joys of society find expression in language, only then does it become literature."[১]

তাই কোনও সমাজের রাজনীতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হলে সেই সমাজ সম্পর্কে লেখা রচনার উপর নির্ভর করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের শেষ পর্বের সুধাকর দলের সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যায়। সুধাকর দলের লেখকদের কাছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন এক আদর্শ ও প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব। সুধাকর দলের লেখকরা হজরত মহম্মদের (সা.) জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ লেখার পাশাপাশি হজরত উমর ফারুক (রা) এর জীবন ও কর্মকে ভিত্তি করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখেছিলেন। এর ফলস্বরূপ বাংলার মুসলিম সমাজ অনেকাংশে খ্রিষ্টান ধর্মান্তকরন থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

রাশেদীন খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেউ কেউ ইসলামের 'সেন্ট পল'[২] বলেছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে ইসলামের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নবী মুহাম্মদ (সা.) এর অন্যতম একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ইসলাম প্রচারে সফল হয়েছিলেন এবং আরবের মুসলিম সমাজকে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মতো কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। হজরত উমর (রা) বাইজান্টাইন ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়ের মূল কাণ্ডারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আপসহীন নীতিবাদী ব্যক্তি। তাঁর কার্যকলাপের জন্য তিনি 'আল-ফারুক'[৩] বা 'সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর খেলাফতের সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সুধাকর দল হজরত উমর (রা) ফারুকের জীবনী লেখার মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজকে এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে ইসলামি শাসন মানে কেবল গোঁড়ামি নয়, বরং তা হল এমন একটি প্রগতিশীল, জনকল্যাণমূলক ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা[৪], যা আজও আধুনিক বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় রূপে গণ্য হতে পারে।

উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে বাংলায় ইসলামের শুদ্ধ অনুশীলন, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন তথা ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন ইংরেজরা কঠোরভাবে দমন করেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টান যাজক ও মিশনারিরা এদেশে এসেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার। কিন্তু ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যাজক সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। মুসলমানদের উপর শাসকের আক্রমণের প্রভাব প্রধানত সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। তার ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিকভাবে সংগঠিত হওয়া ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। অবিভক্ত বাংলাদেশের ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানের মধ্যেও ইংরেজ প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কিছু মুসলমান খ্রিষ্টান হতে থাকে। অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক সুবিধা ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগ করে তদানীন্তন রাজধর্ম গ্রহণে তৎকালীন বাংলার মুসলমানদেরও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।[৫]

উনিশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজকে এই ধরনের খ্রিষ্টান ধর্ম-মুখিতা থেকে বাঁচিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো ব্যক্তিরা। শতাব্দী শেষে মুসলমানদের মধ্যে এরকম আন্দোলন শুরু করেছিলেন যশোর নিবাসী বাগ্মীপ্রবর মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তারই হাতে দীক্ষিত মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন।[৬] এঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ওয়াজ। গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় বক্তৃতা করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ আশাতীত ফলও পেয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে খ্রিস্টানদের বাইবেল পাঠ করেছিলেন, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করেছিলেন এবং ইসলাম কুরআন-হাদীস তাঁর আয়ত্তে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি যুক্তির সাহায্যে যেভাবে খ্রিস্টানদের ধর্ম বিষয়ক নানাবিধ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছিলেন তা আজকের দিনের আলোকেও অনন্য সাধারণ। বাঙালী মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দান অনস্বীকার্য হলেও তিনি এবং তার

অনুগামী জমিরুদ্দীন সংঘবদ্ধ হয়েও সেদিন আপামর মুসলিম সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে পারেননি। তবে এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই যুগের বাঙালী মুসলমানদেরকে ইসলামমুখী করে তুলেছিল একটি বিশেষ দল। সে দলটিকে 'সুধাকর দল' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।[৭]

> "খ্রিষ্টান মিশনারিদের আক্রমণাত্মক প্রচারণার মুখে মুসলমান সমাজ যখন দিশেহারা, তখন সুধাকর দলই প্রথম কলম ধরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও যুক্তিনিষ্ঠা প্রমাণে সচেষ্ট হয়।"[৮]

সুধাকর দলের মধ্যে প্রধান সদস্যরা ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাঁশদহের অধিবাসী এবং কলকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের অন্তর্গত চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, বশিরহাটের মোহাম্মদপুর নিবাসী মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। প্রাথমিকভাবে এই দল প্রয়োজনীয় অর্থ ও ব্যবস্থাপনার অভাবের জন্য মুসলিম কৃষ্টি এবং ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতগুলো বই-এর অনুবাদ করে তা খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করেছিলেন। এরপর এরা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী দ্বারা ফারসী ভাষায় রচিত 'নেচার এবং নেচারিয়া' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করে তাকে 'এসলাম তত্ত্ব' নাম দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন। এর অল্পদিন পরেই মওলানা আব্দুল হক হাক্কানীকৃত 'তফসিরে হাক্কানী'র উপক্রমণিকা ভাগ থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবাদক বিষয়গুলি অনুবাদ করে 'এসলাম তত্ত্ব' রূপে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। 'এসলাম তত্ত্ব' [বা মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ] এর প্রথম খণ্ড ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৯] এসলাম তত্ত্ব খুব বেশী দিন চলেনি। তবু এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং ময়মনসিংহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান এবং বর্ধমানের কুসুম গ্রামের জমিদার মুন্সী মোহাম্মদ এব্রাহিমের অর্থানুকুল্যে শেখ আবদুর রহিম এবং মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৮৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম সংখ্যা 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়েছিল। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, এই দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের প্রভাব এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করে মুসলিম বীরদের বীরত্বগাথা ও ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে,

> "রেয়াজউদ্দীন আহমদই প্রথম অনুভব করেছিলেন যে, বাংলায় মুসলমানি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বড়ই অভাব এবং এই অভাব পূর্ণ না হলে জাতির মানসিক মুক্তি সম্ভব নয়।"[১০]

সুধাকর দলের লেখকদের রচনায় হজরত উমর ফারুক (রা)-এর জীবনী ও তাঁর শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস ও আদর্শকে বাংলার মুসলিম জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

> "রেয়াজউদ্দীন আহমদের রচনা কেবল জীবনী নয়, বরং তা ছিল একটি জাতির জাগরণের মন্ত্র। উমর ফারুকের বীরত্বগাথা বর্ণনা করে তিনি মুসলমানদের হারানো শৌর্য-বীর্য মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।"[১১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম বীরদের জীবনী ও ইতিহাস লেখায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, মূলত তা পূরণে 'সুধাকর' দল এগিয়ে এসেছিল। এক্ষেত্রে ইসলামি ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে হজরত উমর (রা)-এর জীবনী রচনা গুরুত্ব পেয়েছে। শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯–১৯৩১) ছিলেন সুধাকর দলের প্রাণপুরুষ।[১২] তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও মহত্ব বাংলা ভাষায় প্রচার

করা। ড. খোন্দকার সিরাজুল হক তাঁর গ্রন্থ 'শেখ আবদুর রহিম: জীবন ও সাহিত্য' (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭০) এ বলেছেন যে শেখ আবদুর রহিম এবং তার সহকর্মীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজি বা ফারসি ভাষায় লিখলে তৃণমূল স্তরের বাঙালি মুসলমানের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই তারা সাধারণ বাঙালি মুসলমানের কাছে পৌঁছানোর জন্য মাতৃভাষা বাংলাকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলার পরিবর্তে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় লিখতেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধে হজরত উমরের (রা) শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার এবং তাঁর 'ফারুক' (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধির তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উমর (রা)-এর প্রশাসনিক সংস্কারগুলোকে বাঙালি মুসলমানদের সামনে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মডেল হিসেবে তুলে ধরেন।

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯–১৯১৯) ছিলেন এই দলের সবচেয়ে বাগ্মী সদস্য। তাঁর লেখায় তীব্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আভাষ দেখা যায়। তাঁর 'সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) গ্রন্থে হজরত উমর (রা)-এর শাসনকালকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার একটি লাইন উল্লেখ করা হল (মূল বইটির ভাষা ছিল সাধু রীতিতে)। মাশহাদী উমরের (রা) বীরত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

> "খলিফা উমর ফারুকের ন্যায়বিচার ও তেজস্বিতা যদি আজ মুসলিম সমাজের আদর্শ হইত, তবে এই অবনতি ঘটিত না। তিনি অর্ধ-পৃথিবী শাসন করিয়াও সামান্য পর্ণকুটিরে বাস করিতেন এবং সাম্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।"

মাশহাদী দেখিয়েছেন কীভাবে একজন শাসক সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেও পৃথিবীতে বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। মুন্সি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের (১৮৬২–১৯৩৩) অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ ১৮৮৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৮৩ সালে কলকাতায় যাওয়ার পর তিনি শেখ আবদুর রহিম ও মেয়াজউদ্দীন আহমদের সাথে মিলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতি রোধে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি 'হজরত উমর (রা)-এর জীবনী' এবং তাঁর বিখ্যাত তিন খণ্ডের 'ইসলাম-ইতিহাস' রচনা করেন। এই গ্রন্থটি রচনার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। প্রথমত, ১৮৮০-এর দশকে অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, যশোর, খুলনা ও ২৪-পরগনা অঞ্চলে অনেক মুসলিম খ্রিষ্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করছিলেন। মুসলিম সমাজকে তাঁদের স্বধর্মের গৌরবময় ইতিহাস ও আদর্শের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই ধর্মীয় রূপান্তর রোধ করতে তিনি হজরত উমর (রা.)-এর মতো মহাপুরুষদের জীবনী লেখেন। দ্বিতীয়ত: তিনি সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও খলিফাদের শাসনকাল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এটি রচনা করেন]। তৃতীয়তঃ সুধাকর দলের সদস্যদের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি সাহিত্য ও ইতিহাসকে সহজ বাংলায় ভাষায় মুসলিমদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হজরত উমররের (রা) জীবনী রচনার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের কাছে হজরত উমরকে (রা) ন্যায়বিচারক, প্রশাসনিক দক্ষ, বীর ও চারিত্রিক দৃঢ়তার একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে অঙ্কিত করেছিলেন।[১৩] বস্তুতপক্ষে, মুন্সি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বিস্মৃত জাতিসত্তাকে তাঁদের গৌরবময় অতীতের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

'সুধাকর' পত্রিকা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুদিন চলেছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমানেরা তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা লাভ করেছিল। সেকালে বঙ্কিম প্রমুখ মুসলিম-বিরোধী লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব লেখা লিখতেন, 'সুধাকর' এ তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হত।[১৪] সুধাকর দল বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে আধুনিক

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কেউ যে অগ্রসর হয়নি, তা কিন্তু বলা যায় না। এই দলের বহু আগে থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার আগে শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীকে দেখা যায়। তার রচনা 'ভাবনা' এবং 'উচিত শ্রবণ' ১৮৬৫ সালের আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলায় মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় 'সুধাকর' দল যেভাবে প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছিলেন, এঁদের আগে তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন সচেতন জাতীয়তাবোধও তাঁদের আগের কোনও মুসলমান-রচিত সাহিত্যে ফুটে ওঠেনি। এঁরা ইসলাম ধর্মের গৌরব, মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। পরাধীন ও শোষিত বাঙালি মুসলিমদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে এঁরা আরবী- ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন হজরত মহম্মদের (সা) ও তাঁর সাহাবীদের বিশেষত হজরত উমরের (রা) এবং অন্যান্য ওলী, পীর-পয়গম্বরের জীবনী লিখেছেন। সৈয়দ আলী আহসান প্রশংসা করে লিখেছেন যে, সুধাকর দলের সদস্য রেয়াজুদ্দীন আহমদের ভাষা ছিল প্রাঞ্জল কিন্তু গম্ভীর, যা হজরত উমর (রা) এর মতো মহান ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই ছিল।[১৫] এই ভাষা মুসলিম পাঠকদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মীর মশাররফ হোসেন হজরত উমর (রা) এর জীবন থেকে গভীর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাই মুসলিম সমাজের হীনম্মন্যতা দূর করতে ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য হজরত উমরকে (রা) নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার নাম ছিল 'হজরত উমরের ধর্মগ্রহণ লাভ' (১৯০৫ সাল)। তিনি মুসলিম সমাজকে এই কবিতার মধ্যে দিয়ে একথা বলতে চেয়েছেন যে, ধর্ম গ্রহণ বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেবল আধ্যাত্মিক নয়, এটি মানবিক মনোভাব ও জীবনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার জীবনের স্পন্দন এবং অন্তর ও বহির্জীবনের প্রকাশ যে সেই জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, সেই ব্যাপারে সুধাকর দলের বোধ ছিল প্রখর। বাঙালী মুসলমান জাতির ঘোর দুর্দিনে এঁরাই সেই জাতিকে নিজ ঘরমুখো করেছিলেন এবং আত্ম অনুসন্ধানে সহায়তা করেছিলেন।[১৬] এক কথায় এই 'সুধাকর' দল যেভাবে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। সুধাকর দল তাদের লেখার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মানসে যে পরিবর্তন এনেছিল, তাকে এক অর্থে "সাহিত্যিক বিপ্লব" বলা যেতে পারে। সুধাকর পত্রিকার মাধ্যমে তারা যে সাংবাদিকতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন, তার ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তীকালে 'নবনূর,' 'কোহিনূর', 'সওগাত', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'শিখা' র মতো সাহিত্যিক পত্রিকাগুলি সাহসিকতার সাথে সাহিত্যচর্চা করতে পেরেছিল। সুধাকর দলের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের সাহিত্যিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতপক্ষে, মুসলিম জাতি এবং এই জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের গতিধারা সুধাকর দলেরই হাতে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে 'সুধাকর' দলের ভূমিকা এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করা দরকার। 'সুধাকর' পত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম বাঙালি মুসলমানরা বুঝতে পারে যে নিজস্ব ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় বজায় রেখেও উচ্চমানের বাংলা সাহিত্য চর্চা করা সম্ভব। পরবর্তী মুসলিম সাহিত্যিকদের কাছে এদের সাহিত্যচর্চা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে এবং সেই কারণেই বাংলার মুসলিম জীবনেও নবীন অধ্যায় এসেছে এবং বাঙালী মুসলমানের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে নব গৌরবের সূচনা হয়েছে। তাই দেখা যায় যে পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামও হজরত উমর (রা) জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'উমর ফারুক' কবিতা রচনা করেছিলেন। এই কবিতার মাধ্যমে তিনি অতীতের এক মহান চরিত্রকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আদর্শ রূপে তুলে ধরেছেন। মুসলিম মননে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কবিতাটি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Maxim Gorky. *On Literature*. Foreign Languages Publishing House, 1953.

২. Hart, Michael H. The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History. Hart Publishing Company, Newyork, 1978, p. 218

৩. Qazi, Moin. Umar Al Farooq: Man and Caliph. 2015, p. 218.

৪. আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮, পৃ. ৮০-৮৪।

৫. হাই, মুহাম্মদ আব্দুল ও আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)। একাদশ সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯০-৯৯।

৬. তদেব, পৃ. ৯০-৯৯।

৭. ছফা, আহমদ। বাঙালি মুসলমানের মন। মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ১১-১৪।

৮. Ahmed, Rafiuddin. The Bengal Muslims, 1871-1906: a quest for identity. Oxford University Press, 1996, p 104-106.

Dey, Amit. The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety 1850-1947. Readers Service, 2014, p. 107-123.

৯. আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮, পৃ. ৮২।

১০. আনিসুজ্জামান। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)। কলকাতাঃ প্রতিভাষ, ১৯৯৯, পৃ. ২৩২-২৩৬।

১১. Ahmed, Sufia. Muslim Community in Bengal. 1884-1912', Dhaka, 1974, p. 160-161.

১২. কাদির, আবদুল সম্পাদিত। মাশহাদী-রচনাবলী। কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, পৃ. ৫-৬৪।

১৩. Dey, Amit. The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety 1850-1947. Readers Service, 2014, p. 107-108.

১৪. আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮, পৃ. ৯০-৯৬।

১৫. Roy, Asim. The Islamic syncretistic tradition in Bengal. 1983, p. 246- 254.